মূলপাতা

কুমড়ো ফুলের ঘর

Abdullah Mahmud Nojib

May 2, 2019

9 MIN READ

নাড়ার আগুনে খই ফোটাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। সরু আইল ধরে হেঁটে যাচ্ছে অচেনা কোন হাটুরে। কাবাডি খেলার হৈ-হুল্লোড়ে বিল মাতিয়ে রাখছে দুরন্ত কিশোরগুলো। আমরা বসে বসে দেখি। পেয়ারা গাছের নিচে মোড়া নিয়ে বসে আছি আমরা তিনজন। আমি, ছোটফুফুআর ছোট বোন রুবাইয়া। ইটের উপর বড়ই বিচি রেখে আরেকটা ইট দিয়ে ভেঙে লাল পাক্কন বের করার চেষ্টা করি আমি। ছোট ফুফুহাসতে হাসতে ফ্ল্যাশ ব্যাকে চলে যান.. [চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাকে প্রমিত রূপ দিচ্ছি]..

‘সেদিনের সেই এতটুকুন বাচ্চাটা... কত বড় হয়ে গেলি বাপ!’

আমি হাসি। ফুফুর গা ঘেঁষে বসি। আমার চুলে বিলি কাটেন। কখনো ‘তুমি’, কখনো ‘তুই’- সম্বোধনের রকমফের উপভোগ করতে থাকি।

‘তোমাকে কোলে করে বড় করেছি আমি। সারাদিন মাথায় করে বাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা ঘুরে বেড়াতাম। তুমি কারণে বা অকারণে কাঁদলে বাবাজি আমাকে বকা দিতেন। তড়ে নরম তুলতুলে হাতের তালুতে আমার আঙুল ছোঁয়াতাম, মুঠোয় ধরে রাখতি যখন, কত ভালো লাগত আমার, জানিস?'

আমি তন্ময় হয়ে শুনতে থাকি। দূরে কোথাও দাদুভাইয়ের সফেদ পাঞ্জাবি দেখা যায়। হাট থেকে ফিরছেন। দুই হাতে দুটো সওদাভর্তি থলে। মাগরিবের আযান হয়ে যায়। আমরা ঘরে ঢুকে পড়ি। আব্বুর সাথে মসজিদে রওনা হই। রুবাইয়া কাঁধসমান চুলের উপর আব্বুর টুপি গেড়ে দিয়ে বেণী দোলাতে দোলাতে আমাদের সাথে চলে যায়। মুসল্লিরা পিচ্চির কাণ্ড দেখে হাসে। তিড়িং বিড়িং লাফিয়ে আমি যখন মসজিদ থেকে ফিরছি, তখন গাঢ় অন্ধকার জেঁকে বসছে। রূপকথার গল্পে আর ছাটদের সখ কত কথা শুনতে শুনতে একটা ভৌতিক ডর আমার মনে ভর করে। প্রকাণ্ড শিশুগাছটির কাছে আসতেই তাই আব্বুর হাত শক্ত করে ধরি। বাড়ি ফিরেই দেখতাম—দাদীমণি সবার মাঝে বিলি করছেন হাট থেকে আনা মুড়কি আর তিলের খাজা। হাপুস-হুপুস গাপুস-গুপুস করে আবার ছোট ফুফুর কাছে বায়না ধরতাম, ছোটবেলার গল্প শোনাও!

চাঁদনী রাতে মাদুর পেতে বসলাম আমরা। ফুফুর কোলে তাঁর প্রথম ভালোবাসা –মাইমুনা। একটু পর পর কাঁদে। আবার নীরব হয়ে গল্প শোনায় যোগ দেয়।

‘ওই কোণায় টিনশেড একটা রান্নাঘর ছিল। আমি তোমাকে মাথায় করে নিয়ে চালের গোড়ায় বসিয়ে দিলাম। তুমি তিরতির করে চালের আগায় উঠে গেলে। আমি ভয়ে অস্থির..পড়ে গেলে এখন কী করবো? তুমি ওখানে বসে মিটিমিটি হাসছ, আর আমি এখানে কাঁদছি। বাবাজি দেখলে তো আমাকে আস্ত রাখবে না! কী করি, কী করি। আল্লাহকে ডাকছিলাম। অবশেষে আস্তে আস্তে তুমি নেমে আসলে। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।’

আমি হাসি চাপাতে পারি না। রূপকথার মতো লাগে। বিস্ময়ের ঘোর কাটে কি কাটে না। ফুফু আমি কি তাইলে দুষ্ট ছিলাম?

‘তা কি আর বলতে হয় পাগলা?’

ফুফুর শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবার সময় ঘনিয়ে আসছে। মনটা একটু একটু বিষাদে হয়ে যেতে শুরু করছে। স্কুল থেকে ফেরার সময় মেজো দাদা আদর করে একটা চিপস কিনে দিলেন। এই মানুষটা ছোটবেলায় আমাকে ক্ষ্যাপাতে চেষ্টা করতেন। সুযোগ পেলেই। আবার প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। এখন তো কথাই নেই, দেখা হলেই নাতি নাতি রব তুলে জড়িয়ে ধরেন। আমি ছাদে চলে এলাম। তখন আমাদের বাড়ি দোতলা হয়নি। একতলার ছাদে ধানের গোলা ছিল। গোলার একপাশ ঘেঁষে ফুফুবসে আছেন।

মাইমুনা হামাগড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি ইউনিফর্ম না খুলেই নাচতে নাচতে চলে গেলাম ফুফুর কাছে। চিপসটা খাচ্ছি। একে একে যখন শেষ হলো পুরো প্যাকেট, তখন চেহারাটা অন্ধকার করে ফুফুআমাকে বললেন,

“কেমন ভাতিজা হলি তুই আমার? মজা করে করে একাই চিপসটা খেলি, ফুফুকে একটু সাধলি না!"

আরে, তাই তো! আমার প্রচণ্ড অনুশোচনা হলো। তবু একটু আত্মপক্ষ সমর্থ চেষ্টা করলাম।

‘আপনি তো আমাকে বলেননি ফুফু!'

‘বলতে হবে কেন? তুই আমাকে ভালোবাসলে নিজ থেকেই দিতি!'

কথাটা ভেতরে এসে লাগল। মাথার পেছনে দুইহাত দিয়ে চেপে ধরে ক্যাপটা ভাঁজ করে ফেললাম, আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কিশোরসুলভ ভঙ্গিতেই নিজেকে শোনালাম, ‘এত বোকাসোকা হলি কেন রে!?' কিন্তু আমার অবস্থা এমন যে, ‘বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।' গত্যান্তর না দেখে ভ্যাঁ করে কেঁদেই দিলাম।

ফুফুমুখ টিপে কিছুক্ষণ হেসে আমার রোদনপর্ব উপভোগ করে নিয়ে কাছে টেনে নিলেন।

‘বোকা কোথাকার! আমি তো দুষ্টুমি করেই বলেছি! কতদিন তোকে কাঁদতে দেখি না..আজকে তোর কান্নাটা দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। তোকে কাঁদতে দেখলে আমার ভালো লাগে, বাপ!’

আমি জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছে ফেললাম।

ফুফুর শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবার সময় আমি আর রুবাইয়া ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতাম। আবার যখন নাইয়র খেতে আসতেন, কিংবা কোনো ছুটিতে বেড়াতে আসতেন, তখন আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না। এভাবে চলছিল সময়ের চাকা। খুব দ্রুত গতিতেই। আমরা বড় হতে লাগলাম। ফুফুর কোল জুড়ে আরও দুটো জান্নাতী প্রজাপতি এলো। আমাদের বাড়িতেও সদস্যসংখ্যা বাড়তে লাগল। মেজো আব্বু দেশে এলেন, একজন মেজো আম্মু ঘরণী হয়ে এলেন। ছোট আব্বু আসলেন, আমরা একজন ছোট আম্মু পেলাম। আসলেন সেজো আম্মু। অল্প কদিন আগে আমি আর রুবাইয়া ছাড়া একান্নবর্তী বাড়িতে আর কেউ ছিল না। দেখতে না দেখতেই কচিকাচার কিচিরমিচির রবে আমাদের চারপাশ ভরে গেল। বাচ্চাকাচ্চা স্কুলে দেওয়ার পর ফুফুইচ্ছেমতো আর বাপের বাড়ি আসতে পারেন না। আমার বইপ্রেমের গাঙে যখন ভরা জোয়ার, তখন ফুফুকয়েকদিন পরপরই কিছু কাগুজেবস্তু পরম মমতায় আমার হাতে ধরিয়ে দিতেন। আমি পৃথিবীজয়ের আনন্দ তলী স্টেশনে ছুটে যেতাম। মোস্তফা লাইব্রেরি, ছাত্রবধু লাইব্রেরি—ঘুরে ঘুরে ইচ্ছে মতোন বই কিনতাম। ফুফুবইগুলো নেড়েচেড়ে দেখতেন, কয়েক পাতা পড়ে হাসতেন। নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকে আমার মাতলামি দেখে আনন্দ পেতেন। আহা, সোনামোড়া দিনগুলো আমার!

ঢাকায় এলাম। ফুফুর সাথে যোগাযোগ আর কথাবার্তা—সব মুঠোফোনেই সীমাবদ্ধ হয়ে এলো। ফুফুযখন আমাদের বাড়িতে, তখন হয়তো আমার ক্লাস বা পরীক্ষা। আবার আমি যখন বাড়িতে, ফুফুতখন শ্বশুরবাড়িতে। ব্যাটে-বলে না মিলে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎটাই আকাশের চাঁদ হয়ে গেল। কাকতালীয়ভাবে কখনো মিলে গেলে কথা-ই নেই।

আলিম পরীক্ষা ঘনিয়ে আসছে। দাদুভাই হাসপাতালের বিছানায়। বিষণ্নতার ঘন প্রহরে আচমকা খবর এলো, ফুফুর শরীরে মরণব্যাধি ক্যান্সার বাসা বেঁধেছে। তারপর কর্ণফুলী নদীর বুক চিরে অনেক জল গড়িয়েছে, সাঙ্গু নদীর দুই তীর অনেকবার ভেঙেছে, ডলু নদীর হাওয়া অনেকবার দিক হারিয়েছে। দাদুভাইকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিলাম। ফুফুর সুস্থ হবার সম্ভাবনা ক্রমশ ফিকে হতে আসতে লাগল। ঢাকায় আনা হলো। মিরপুরে একটা হাসপাতালে ফুফুকে থেরাপি দেওয়া হতো। ফুফা আর মিষ্টি চাচ্চু সাথে থাকতেন। আমি আর রিদওয়ান ভাইয়া হোস্টেল থেকে সুযোগ পেলেই যেতাম। সেই চিরচেনা হাসিটা পাংশু হয়ে গেছে। শরীরটা শুকিয়ে পাটকাঠি। তবুও আল্লাহর স্মরণ থেকে ক্ষণিকের জন্যে বিস্মৃত হতেন না ফুফু। প্রচণ্ড অসুস্থতার মধ্যে বেডে-ই ফরয সালাত সেরে নিতেন। ফুফাকে হঠাৎ কখনো ডেকে বলতেন,

'আমার ছেলেমেয়েগুলোকে পড়াশোনার জন্যে কখনো বকা দেবেন না। ওরা যতটুকু পারে, পড়বে। অতিরিক্ত চাপ দেবেন না।'

আমাকে কখনো বলতেন,

'নাজিব! আমার ছেলেমেয়েগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে বেশি করে দুআ করিস, বাপ!'

আমার পাষাণ হৃদয় গলে যেত। ধরে রাখা যেত না নিজেকে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতাম। হাসপাতালের করিডোরে পায়চারি করতাম। নামাজঘরে গিয়ে অঝর নয়নে কাঁদতাম। স্মৃতিগুলো বড় বেশি আহত করত আমাকে।

ফুফুকে ভারত নেওয়া হলো। ফিরে আসার পর কিছুটা আশার আলো দেখছিলাম আমরা। আমার পরীক্ষা ঘনিয়ে আসলেও আমার হোস্টেলে আসতে মন চাচ্ছিল না। এর মধ্যেই ফুফুর অবস্থা আবারও আশঙ্কাজনক। চট্টগ্রাম শহরে একটা হাসপাতালে ভর্তি হলেন। আমি আর আব্বুম্মু এক সপ্তাহেই তিনবার গিয়েছি দেখতে। যখন রক্তবমি হতো, আমি তখন রুমের বাইরে এসে চোখ মুছতাম। দুই হাত আকাশপানে উঠত আমার অজান্তেই। একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, ফুফু আমার সাথে কথাও বলতে চাচ্ছেন না। আমার জন্যে সেই সময়টা বড় বেশি বেদনার ছিল। শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকে প্রচণ্ড রকম বিধ্বস্ত ফুফা কঠিন সেই সময়টাতে আল্লাহর ওপর সুদৃঢ় ঈমানে অবিচল একজন মানুষ—ফুফার কথা, আচরণ, সহমর্মিতা আর আন্তরিক শুশ্রূষা দেখে আমি প্রথমবারের মতো একজন মহামানবকে আবিষ্কার করেছিলাম। ফুফার অতটুকু ভালোবাসার পাখায় ভর করেই ফুফু শেষ মুহূর্তগুলোতে বেঁচে ছিলেন।

আলিম পরীক্ষার পাঁচদিন বাকি আছে। আমার আসার মন নেই। বাস্তবতার কাছে হার মানলাম। টিকেট ছিল আটটা পঁয়তাল্লিশে। আটটায় যখন বাড়ি থেকে বের হবো, তখন প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া। আমার বইয়ের ব্যাগটা আম্মু আর ছোট আম্মু মিলে পলিথিনে রেপিং করতে করতে কিছু সময় গেল। আব্বু বাইরে রিকশা খুজতে খুজতে আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলো। অগত্যা দ্বিগুণ ভাড়ায় একটা সিএনজি এনে তাতে চড়ে বসলাম। সময় হয়ে গেছে, কাউন্টার থেকে ফোনের ওপর ফোন আসছে। আব্বু, করজোড়ে রিকোয়েস্ট করে যাচ্ছেন, বাস যেন দশ মিনিট লেট করে ছাড়া হয়। তাঁরা রাজি হলেন। তাকদিরের কী লিখন, রাস্তার মাথা মোড়ে আসতেই সিএনজি'র স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। দশ মিনিট ওখানেই শেষ; কিন্তু শেষ-মেশ আর স্টার্ট নিল না। আরেকটা সিএনজিতে আমার লাগেজ আর বইয়ের বস্তাটাসহ নিয়ে কোনোরকম কাউন্টারে পৌঁছতে পৌঁছতেই জানা গেল, বাস একটু আগে ছেড়ে চলে গেছে।

আব্বু আর আমি একবার ভাবলাম, আজকে আর না যাই, কালকেই না হয় যাবো। পরে ভাবলাম, পরীক্ষার বেশিদিন নেই, পরের ট্রিপের কোনো টিকেট পাওয়া যায় কি না, দেখা যাক। দশটা বিশের একটা টিকেট পাওয়া গেল। আমি রওনা হলাম। আব্বু, কেন জানি একটু বিষণ্ণ ছিলেন বিদায় দেওয়ার সময়। বাস যখন কুমিল্লা। চৌদ্দগ্রামে হোটেল বিরতি দিয়েছে, সময় তখন তিনটা বেজে পঁচিশ মিনিট। *সৌদি আরব থেকে ছোটাচ্চু* ফোন করে আচমকা বললেন,

'নজীব, জানাযা কয়টায় হবে?'

'কীসের জানাযা? কী হয়েছে চাচ্চু?'

'কীসব বলছ তুমি? ফুফুমারা গেছে, জানো না?', বলতে বলতে চাচ্চুর গলা ধরে আসে। ফোন কেটে যায়। আমি মিষ্টি চাচ্চুকে ফোন দিই।

'সরি নজীব, তুমি ভেঙে পড়বা তাই ফুফা তোমাকে না জানাতে বলেছিলেন। তোমার ফুফু বারোটার সময় আল্লাহর কাছে চলে গেছেন।'

আমি বাসের ভেতরেই বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদতে থাকি। তবে কি আমি আসার সময় প্রকৃতির এমন আচরণ এরকম কিছুর-ই পূর্বাভাষ ছিল?

সুপারভাইজারকে বলি, আমাকে নামিয়ে দেন। তিনি রাজি হন না এই মাঝপথে এত রাতে আমাকে নামিয়ে দিতে। উপরন্তু আমার দুটো বড় লাগেজ। আমি কোথায় যাবো এগুলো নিয়ে? রিদওয়ান ভাইয়া জানালেন, জানাযা দশটায়। ঢাকায় পৌঁছে আবার। ব্যাক করে জানাযা পাওয়া সম্ভব-ই না। আমার প্রিয়তম ফুফার ফোন পেলাম। এমন দুঃসহ শোকাবহ মুহুর্তেও আড়ষ্ট গলায় আমাকে বললেন,

'তোমার ফুফুকে আমাদের চেয়েও আল্লাহ বেশি ভালোবাসতেন, তাই তাঁর কাছে নিয়ে গেছেন। তোমার সামনে পরীক্ষা, তাই স্বল্প সময়ে এত লং জার্নি করা উচিত হবে না, না হলে তোমার জন্যে জানাযা একটু দেরি করতাম। তুমি ওখান থেকেই ফুফুর জন্যে দুআ করো।'

এতটুকুবলতেই কান্নারা দলা পাকিয়ে আসে ফুফার গলায়। কেটে দিতেই আব্বুর ফোন। একইকথা, একই সুরে। আম্মুর মোবাইল থেকে কান্নারতা দাদীমণির-ও একই সান্ত্বনা আমার জন্যে।।

মেনে নিলাম আল্লাহর ফায়সালা। স্বার্থপরের মতো চলে এলাম।

পরীক্ষা-ও দিলাম।

পরীক্ষা শেষ করে ওইদিন-ই বাড়ি গিয়ে ফুফুর কবরের কাছে গেলাম।

কবরের উপর লাউয়ের ডগায় একটা ফুল ফুটেছে। দুআ করলাম, আল্লাহ যেন জান্নাতেও ফুফুকে এমন ফুল্ল-ফুলেল আঙ্গিনায় রাখেন।

প্রায় এক বছর হতে চলল আমার প্রিয়তমা ফুফুনেই। আজকে কেন জানি মনে পড়ছিল মানুষটাকে। সেই হাসিটা। সেই স্মৃতিগুলো। কতবার ফুফুর কবরের কাছে গিয়েছি। আমার কোনো ডাক শোনে না পাষাণীটা! কবরের ওপর ফুটে থাকা কুমড়ো ফুলেরা নৈঃশব্দের তরজমা করে। জানাযায় উপস্থিত হতে পারিনি, হয়তো অভিমান করে বসে আছে; কিন্তু আমার অশ্রুরা কি এতকিছু বোঝে, ফুফু? আমি একটু হলেও সান্ত্বনা পাই, ছোটবেলায় তুই-ই তো একবার বলেছিলি, 'তোকে কাঁদতে দেখলে আমার ভালো লাগে, বাপ!'

এই আমি কাঁদছি। তোর খুব ভাল্লাগছে, ফুফু?